উপন্যাস

গোপনে

ইমদাদুল হক মিলন

শারমিন আজ খুব সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে।

হালকা আকাশি রংয়ের টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি। সকালবেলা গোসল করে শাড়ি পরার ফলে অপূর্ব লাগছে তাকে। যেন এই মাত্র ফুটে ওঠা এক গোলাপ।

ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল শারমিন। তার চুল খুব ঘন। সহজে শুকাতে চায় না। হেয়ার ড্রাইয়ার দিয়ে চুল শুকালো শারমিন। মাথার পেছন দিকে চুলগুলো গোছা করে তুলে ফুলের মতো একটা পাঞ্চক্লিপ দিয়ে আটকালো। তারপর হালকা করে গাঢ় খয়েরি রংয়ের লিপস্টিক লাগালো, বেশ মিষ্টি ধরনের একটা পারফিউম স্প্রে করল। পারফিউমের গন্ধে তার শরীর এবং রুম দুটোই ভরে গেল। সুন্দর সাজ এবং গন্ধে মন ভাল হয় মানুষের। শারমিনের একটু বেশি হলো। ড্রেসিংটেবিলের লম্বা আয়নার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল, এই সাজ তুমি আজ কাকে দেখাবে?

সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষের কথা মনে পড়ল শারমিনের। কয়েকদিন ধরে শারমিনের পিছু নিয়েছে। যখনই ইউনিভার্সিটিতে এসে নিজের ডিপার্টমেন্টের দিকে যায়, সিঁড়ির একপাশে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দায় দেখে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুদের সঙ্গে টিএসসিতে যাওয়ার সময় দুদিন হলো শারমিন খেয়াল করছে দূর থেকে মানুষটা তাকে ফলো করছে। পাঁচ ফিট সাত আট ইঞ্চি লম্বা হবে। উত্তম কুমার টাইপের গোলগাল মুখ। মাথার চুল পাতলা

ধরনের, চেহারা এবং স্বাস্থ্য দুটোই মোটামুটি। ফেডেড জিনসের স্কিনটাইট প্যান্ট পরে থাকে, পায়ে খয়েরি রংয়ের বুট। বেশিরভাগ দিনই গায়ে থাকে লুজ ধরনের হাফস্লিভ শার্ট। চোখে মুখে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা। আর বেশ সিগ্রেট খায়। যতবারই তাকে দেখেছে শারমিন, হাতে সিগ্রেট আছে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানুষটার কথা শারমিন কাউকে বলেনি। ক্লাশের বন্ধুবান্ধব কাউকে না। মানুষটা যেমনি তাকে দেখছে সেও যেন তেমনি করেই দেখছে তাকে। তারপর কোনও একদিন হয়তো তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে, আপনার ব্যাপারটা কী? আমার পিছু নিয়েছেন কেন? কী চান?

আজ সকালে কি সেই মানুষটার কথা ভেবেই আকাশি রংয়ের শাড়ি পরল শারমিন! সুন্দর করে সাজল কি তার কথা ভেবেই!

ধুৎ!

শারমিন লজ্জা পেয়ে গেল! সে আমার কে যে তার জন্য আমি সাজব। আমি সেজেছি আমার জন্য। এই সাজ আমি এখন বাবাকে দেখাব, নীলুফুফুকে দেখাব।

নিজের রুম থেকে বেরিয়ে বাবার রুমে এল শারমিন। কিন্তু বাবা রুমে নেই, তাঁর রুমের সঙ্গে যে চওড়া সুন্দর বারান্দা সেই বারান্দায় মন খারাপ ভঙ্গিতে বসে আছেন। শারমিন এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। বাবা।

মুখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন জাহিদ সাহেব। মন খারাপ ভঙ্গিটা কেটে গেল তাঁর। মুগ্ধ গলায় বললেন, বাহ্। খুব সুন্দর লাগছে।

কিন্তু তোমার কী হয়েছে?

জাহিদ সাহেব একটু থতমত খেলেন। কী হবে? কিচ্ছু হয়নি।

নিশ্চয় হয়েছে। কাল বিকেল থেকে তোমাকে খুব অন্যমনস্ক দেখছি। এখনও কী রকম মন খারাপ করে বসে আছ।

জাহিদ সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কারণটা বুঝিসনি?

বাবার কাঁধে হাত দিল শারমিন। বুঝব না কেন? মার মৃত্যুদিন ছিল কাল।

জাহিদ সাহেব মাথা নাড়লেন। এই সেদিনের কথা, দেখতে দেখতে সাত বছর হয়ে গেল।

শারমিন কথা বলল না, মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

এই বাড়িটা উত্তরার পশ্চিমে, অনেকখানি ভেতরের দিকে। বাড়ির সঙ্গে নির্জন ধরনের একটা রাস্তা। রাস্তার পশ্চিমপাশে লেক। লেকের পাড়ে সবুজ ঘাসের মাঠ আর নানা রকমের গাছ, ফুল পাতাবাহারের ঝোপঝাড়। লেকের ওপারেও এপারের মতোই দৃশ্য। ছবির মতো সুন্দর সুন্দর বাড়ি, গাছপালা। এসবের ওপর সকালবেলার আকাশ আজ রোদে ভেসে যাচ্ছে। বসন্তকালের মনোরম একটা হাওয়া বইছে হু হু করে।

জাহিদ সাহেব আপনমনে বললেন, সময় যে কী দ্রুত কেটে যায়! তুই তখন মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছিস আর এখন ইউনিভার্সিটির শেষ ক্লাশে। কয়েক মাস পর পরীক্ষা। লেখাপড়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে তোর।

শারমিন বাবার দিকে তাকাল। এরকমই তো হওয়ার কথা। সাতবছর কি কম সময়! তারপরও তো সেশনজটের মধ্যে পড়েছিলাম, নয়তো আরও আগেই পড়াশুনা শেষ হতো আমার।

হাত বাড়িয়ে মেয়ের একটা হাত ধরলেন জাহিদ সাহেব। আজ কি তোর ইউনিভার্সিটি খোলা?

শারমিন হাসল। খোলা থাকবে না? হঠাৎ করে ইউনিভার্সিটি বন্ধ হবে কেন?

জাহিদ সাহেব যেন একটু লজ্জা পেলেন। তাই তো! কখন যাবি?

এই তো কিছুক্ষণ পর। দেখছ না আমি রেডি।

জাহিদ সাহেব হাসলেন। দেখছি।

তুমি অফিসে যাবে না?

না।

শুনে খুশি হয়ে গেল শারমিন। তাহলে আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই। ইউনিভার্সিটিতে নেমে গাড়ি ছেড়ে দেব।

জাহিদ সাহেব আনমনা গলায় বললেন, না দিলেও অসুবিধা নেই। আমি আজ কোথাও যাব না।

না বাবা, তারপরও ছেড়ে দেব। ইউনিভার্সিটি এলাকায় গাড়ি রাখা খুব রিসকি। কখন কী গণ্ডগোল লাগবে, আমাদের গাড়িটা পাবে হাতের কাছে, দেখা গেল ওটার ওপর দিয়েই যাচ্ছে সব।

একটু থেমে শারমিন বলল, আমি তাহলে বেরোই।

মাত্র পা বাড়িয়েছে শারমিন, জাহিদ সাহেব বললেন, শোন।

শারমিন ঘুরে দাঁড়াল। বলো।

তোর কি খুব জরুরি কোনও ক্লাশ আছে আজ?

না তেমন জরুরি কিছু নেই। কেন?

তাহলে যাবার দরকার কী?

শারমিন অবাক হলো। কেন বাবা?

বাড়িতেই থাক। সারাদিন বাপমেয়ে গল্প করি।

তখন আবার সেই মানুষটার কথা মনে পড়ল শারমিনের। আজও সে নিশ্চয় আসবে। ইউনিভার্সিটিতে না গেলে শারমিনকে সে দেখতে পাবে না। আকাশি রংয়ের শাড়িতে শারমিনকে দেখলে আজ তার মাথা নিশ্চয় আরও বেশি খারাপ হবে। মুখের ভঙ্গিটা তখন কেমন হবে তার, উদাস বিষণ্ণ থাকবে নাকি একটু উজ্জ্বল হবে। চোখের তারা কি কেঁপে উঠবে তার নাকি স্থির হবে! পলক কি পড়বে না চোখে!

বাবার কথায় ইউনিভার্সিটিতে না গেলে এসবের কোনও কিছুই আজ ঘটবে না।

কিন্তু বাবা কখনও এভাবে বলেন না। তিনি একটু সিরিয়াস ধরনের মানুষ। মেয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে যেমন নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারেও তেমন। ফাঁকিজুকি অলসতা এসব তাঁর চরিত্রে নেই। শারমিনকেও তিনি তাঁর মতো করেই তৈরি করেছেন। শারমিনের চরিত্রে মায়ের প্রভাব বলতে গেলে নেইই, প্রভাব যা সবই বাবার।

সেই বাবা আজ নিজে অফিসে যাচ্ছেন না, শারমিনকেও ইউনিভার্সিটিতে যেতে মানা করছেন, নিশ্চয় তাঁর মন খুব বেশি খারাপ। আজ সারাদিন মেয়ের সঙ্গ চাচ্ছেন তিনি। শারমিনের কি উচিত না বাবাকে সঙ্গ দেয়া! একদিন ইউনিভার্সিটিতে না গেলে কী এমন ক্ষতি হবে। এমন কোনও জরুরি ক্লাশও তার নেই। শুধু ওই ব্যাপারটা। ওটাই বা কী এমন ব্যাপার! আজ না হোক কাল দেখা তো তার সঙ্গে হবেই। এই আকাশি রংয়ের শাড়ি আরেকদিন না হয় পরবে শারমিন।

বাবার রুমের সঙ্গের বারান্দাটা বেশ চওড়া, সুন্দর। রেলিংয়ের ধারে ধারে টবে রাখা নানা রকমের গাছপালা। একপাশে তিনটি বেতের চেয়ার, ছোট্ট একটা টেবিল। বিকেলে সন্ধ্যায় কখনও কখনও রাতে কিংবা ছুটিছাটার দিনে এখানটায় মা বাবার সঙ্গে শারমিনও বসেছে অনেকদিন। কত গল্প গুজব, হাসি আনন্দ। মা মারা গেলেন, সেই হাসি আনন্দের দিন উধাও হয়ে গেল জীবন থেকে।

এখন একা একা বাবা বসে থাকেন কোনও কোনও বিকেলে, সন্ধ্যায় কিংবা রাতে। বাবার সঙ্গে শারমিনও বসে কোনও কোনও সময়।

কিন্তু ওয়ার্কিংডেতে সকালবেলা বাবা বসে আছেন বারান্দায়, শারমিনকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে মানা করছেন, এটা সত্যি একটা রেয়ার ঘটনা।

চেয়ার টেনে বাবার মুখোমুখি বসল শারমিন। আবার সেই প্রশ্নটা করল। তোমার কী হয়েছে বাবা?

জাহিদ সাহেব বিষণ্ণমুখে হাসলেন। বললাম না কিছু হয়নি। তোর মায়ের মৃত্যুদিন ছিল...।

বাবার কথা শেষ হওয়ার আগেই শারমিন বলল, না, আমার মনে হয় শুধু এটাই কারণ না। অন্যকোনও কারণ আছে। নয়তো তোমার মতো লোক অফিসে যাচ্ছ না,

আমাকেও ইউনিভার্সিটিতে যেতে দিচ্ছ না, বলছ আমার সঙ্গে গল্প করে দিনটা কাটাবে, এসব তোমার চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

বেমানান কাজও কখনও কখনও করতে হয়। নয়তো জীবন বড় একঘেয়ে লাগে।

আমাদের জীবনটা একটু একঘেয়েই বাবা।

কী রকম?

মোবারক আর মোবারকের মাকে নিয়ে সংসারে পাঁচজন মাত্র মানুষ আমরা। তুমি আমি আর নীলুফুফু। তুমি আছ তোমার বিজনেস নিয়ে, আমি আমার পড়াশুনা, বুয়া আর মোবারককে নিয়ে ফুফু সামলাচ্ছে সংসার। সকালবেলা তুমি আর আমি দুজন চলে যাই দুদিকে। সন্ধ্যার আগে দুজনের আর দেখাই হয় না।

তোর মা বেঁচে থাকতেও তো এমনই ছিল সংসারের চেহারা। এখন নীলু যেভাবে সংসার চালাচ্ছে তোর মাও সেভাবেই চালাতেন। সকালবেলা তখনও তুই আর আমি দুজন দুদিকে চলে যেতাম।

তারপরও এতটা একঘেয়েমি সংসারে ছিল না। মা খুবই আমুদে ধরনের মানুষ ছিলেন। প্রায়ই আমাদের নিয়ে এদিক ওদিক বেড়াতে যেতেন। এই আত্মীয় বাড়ি, ওই আত্মীয় বাড়ি। লতায়পাতায় আত্মীয়রাও বিয়েশাদির দাওয়াত দিলে ভাল একটা গিফট নিয়ে চলে যেতেন। তুমি আমি দুজনেই খুব বিরক্ত হতাম। কিন্তু মা তবু যেতেন।

মনের দিক দিয়ে সে খুবই ভাল মানুষ ছিল।

মা বেঁচে থাকতে বছরে দুতিনবার ঢাকার বাইরেও যাওয়া হতো আমাদের। কক্সবাজার চিটাগাং রাঙামাটি সিলেট। একবার কক্সবাজার থেকে মহেশখালী চলে গেলাম। একবার বর্ষাকালে সিলেট গিয়ে তুমুল বৃষ্টিতে জাফলং, তামাবিল চলে গেলাম। তোমার মনে আছে, বাবা?

কেন থাকবে না! সব মনে আছে।

শারমিন তারপর আচমকা বলল, চা খাবে?

খেতে পারি। নাশতার পর একবার খেয়েছি। এখন আরেকবার খেলে ভালই লাগবে।

শারমিন উঠল। বলে আসি।

ছুটে কিচেনের দিকে চলে গেল শারমিন। যেভাবে গেল মুহূর্তে ঠিক সেভাবেই ফিরে এল। নিজের চেয়ারে বসে উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, মহেশখালীতে গিয়ে আমরা যে খুব মজা করেছিলাম, সেকথা তোমার মনে আছে বাবা?

কেন থাকবে না!

তাহলে বলো তো মহেশখালীতে যাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টটা কে করেছিল?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। আমি কিন্তু ভুলিনি।

বাবাকে হাসতে দেখে শারমিনও হাসল। ভুলেছ কি না পরীক্ষা হোক।

তালেব।

রাইট। তালেব আংকেল।

সেবারের পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটাই তালেব করেছিল। শৈবালে সুইট বুক করা, হিমছড়ি যাওয়া, মহেশখালী যাওয়া, সব। তালেবদের বাড়িই তো কক্সবাজার শহরে। এবং সে খুব স্মার্ট লোক।

গানও খুব ভাল গায়।

জাহিদ সাহেব অবাক হলেন। তালেবের গানের কথা তোর মনে আছে?

বারে, থাকবে না! একরাতে তালেব আংকেলদের বাড়িতে আমাদের দাওয়াত ছিল। রিতা নামে তালেব আংকেলের এক কাজিন খুব সুন্দর রান্না করেছিল। রূপচাঁদা ফ্রাই, সিদ্ধডিমের একটা আইটেম, কী কী সব সামুদ্রিক মাছ, শুঁটকি। সেইরাতে গিটার বাজিয়ে গান গেয়েছিলেন তালেব আংকেল। এতসব আমার মনে আছে কেন, জানো বাবা?

কেন বল তো?

সেদিন আকাশে বিশাল চাঁদ ছিল। আমরা কক্সবাজার গিয়েছিলাম পূর্ণিমা রাতের সমুদ্র দেখতে।

আইডিয়াটা তোরই ছিল। ওইটুকু বয়সেই চাঁদ খুব পছন্দ করতে শুরু করেছিলি তুই। চাঁদ জ্যোৎস্না এসব দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যেত তোর।

এখনও যায়। আর সেদিন প্রথম গানটা চাঁদ নিয়েই গেয়েছিলেন তালেব আংকেল। পুরনো দিনের গান। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের, এখনও আকাশে চাঁদ ঐ জেগে আছে। চাঁদের কারণেই বোধহয় সবকিছু এত পরিষ্কার মনে আছে আমার।

তবে তালেব খুবই আন্তরিক ধরনের লোক। আমার জন্য জানটা একেবারে দিয়ে দেয়।

তারপরও মহেশখালী যাওয়ার দিন তালেব আংকেলের সঙ্গে তুমি খুব বাজে বিহেভ করেছিলে।

জাহিদ সাহেব খুবই অবাক হলেন। তাই নাকি?

হ্যাঁ। কেন, তোমার মনে নেই?

না একদম মনে নেই। কী করেছিলাম বল তো?

যে ঘাট থেকে মহেশখালী যাওয়ার কথা সেই ঘাটে যেন আগেই স্পিডবোট ঠিক করে রাখেন তালেব আংকেল....

শারমিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই চা নিয়ে এল মোবারকের মা। বাপ মেয়ের মাঝখানকার টেবিলে কাপ দুটো নামিয়ে রেখে চলে গেল।

জাহিদ সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, এখন তালেবের ওপর রাগের কারণটা মনে পড়ছে। ওকে বলেছিলাম ভাল একটা স্পিডবোট রিজার্ভ করে রাখতে। সকালবেলা আমাদেরকে মহেশখালী পৌঁছে দিয়ে আসবে, বিকেলবেলা গিয়ে আবার নিয়ে আসবে। ভাড়া যা হয় নেবে। ও সেটা করেনি।

শারমিনও তার চায়ে চুমুক দিল। আরে না, করেছিল। স্পিডবোটঅলাটা ছিল ধান্দাবাজ। অন্য কে একজন বেশি পয়সা অফার করেছে, তাকে নিয়ে চলে গেছে।

ও হ্যাঁ, তাই। মনে পড়েছে।

তালেব আংকেল কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা বোট ঠিক করে ফেলেছিল। সমুদ্রের ওপর দিয়ে চমৎকার একটা জার্নি হলো আমাদের।

চায়ে চুমুক দিয়ে একটু উদাস হলেন জাহিদ সাহেব। দূরাগত গলায় বললেন, মহেশখালী জায়গাটা বিখ্যাত আদিনাথের মন্দিরের জন্য। পাহাড়ের অনেক উপরে গাছপালা ঘেরা চমৎকার একটা পরিবেশে মন্দির। বহু বহুকালের পুরনো মন্দির। বেশ কষ্ট করে উঠতে হয়। সেই মন্দির দেখে তোর মা যে কী খুশি হয়েছিলেন!

পুরনো দিনের মন্দির টন্দির খুবই পছন্দ করতেন মা। ফেরার সময় সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়েও উঠেছিলাম আমরা। সেই মন্দির দেখেও মা খুব খুশি।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে শারমিন বলল, বাবা, তোমার মনে আছে, আদিনাথের মন্দিরের ভেতর আমি আর মা ঢুকে পড়েছি, তুমি আমাদের ছবি তুলছিলে, পূজারী ভদ্রলোক খুব রেগে গিয়েছিলেন।

ঘটনাটা মনে পড়ল না জাহিদ সাহেবের। চিন্তিত গলায় বললেন, তাই নাকি! এটা তো আমার মনে নেই। আচ্ছা শোন, তোর মা যে বৃষ্টি খুব পছন্দ করতেন সেকথা তোর মনে আছে?

কী বলো, মনে থাকবে না! সিলেট থেকে তামাবিল যাচ্ছি আমরা, ইস সারাটা রাস্তায় যে কী বৃষ্টি!

সত্যি, অমন বৃষ্টি সারাজীবনেই কম দেখেছি আমি। আমরা যাচ্ছিলাম মাইক্রোবাসে। তুই আমি তোর মা আর শাহিন। মানে আমাদের সিলেটের দোকানের ম্যানেজার। সিলেট থেকে জাফলং তামাবিলের রাস্তাটা অসাধারণ। একেবারে ইউরোপ আমেরিকার রাস্তার মতো। একদম সোজা, বেশ চওড়া, বেশ স্মুথ। সেই রাস্তার দুপাশে বিশাল বিল। বর্ষার পানিতে একেবারে টইটম্বুর।

কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছিল না বৃষ্টিতে।

মনে হচ্ছিল ঘন কুয়াশায় ডুবে আছে চারদিক। দশবিশ হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না। তবু যে কী এনজয় আমরা করেছি! বৃষ্টি দেখে তোর মা একেবারে মুগ্ধ। শিশুর মতো ছটফট ছটফট করছিল।

শারমিন চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। আমার মনে আছে, সব মনে আছে।

জাহিদ সাহেবও তাঁর চা শেষ করেছেন। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, কিন্তু তামাবিল পৌঁছাবার পর একদম বৃষ্টি নেই। ওখানে নেমে আমরা ঘুরে বেড়ালাম, ছবি তুললাম, চা খেলাম।

আমি যে একটা কাণ্ড করেছিলাম তোমার মনে আছে, বাবা?

মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন জাহিদ সাহেব। কী বল তো?

বাংলাদেশ-ইণ্ডিয়ার বর্ডারে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখানে বিডিআর চেকপোস্ট। একটা ঝুলন্ত বাঁশের এপারে বাংলাদেশ, ওপারে ইণ্ডিয়া। বাঁশটির সামনে দাঁড়িয়ে ওপাশে একটি পা দিয়ে আমি বললাম, দেখ বাবা, আমি এখন ইণ্ডিয়াতে।

জাহিদ সাহেব হাসলেন। এখন মনে পড়ছে।

আর ফেরার সময়কার কথা তোমার মনে আছে? ওপাশের ভারতীয় আকাশ ছোঁয়া পাহাড় থেকে যে ছবির মতো ঝরছিল ঝরনা।

হ্যাঁ, ঝরনা দেখেও তোর মা খুব খুশি হয়েছিলেন।

তারপর দুজনেই কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। কিছুটা সময় কাটল নিঃশব্দে।

একসময় জাহিদ সাহেব বললেন, তোর মার মনটা খুব নরম ছিল। মানুষের জন্য খুব মায়া ছিল তার।

শারমিন বলল, ঠিকই বলেছ। তোমার মনে আছে বাবা, আমাদের বাড়িতে একটা বুয়া ছিল আছিয়া নামে। বুয়ার নদশ বছরের ছোট ভাইটি রিউমেটিক ফিবারে মরো মরো। পা দুটো অচল হয়ে গেছে। প্রায় পঙ্গু। গ্রামে গিয়ে বুয়া তার ভাইটিকে নিয়ে এল। তোমার ভয়ে উপরে আনল না, সিঁড়ির তলায় শুইয়ে রেখে উপরে এসে মার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আফা, আমার ভাইটারে আপনে বাচান।

সব মনে আছে। ছেলেটির নাম ছিল ইলতুতমিস। আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তোর মা তাকে শিশু হাসপাতালে ভর্তি করাল। ছসাত মাস চিকিৎসা করাল। কিন্তু পুরোপুরি সেরে সে ওঠেনি, একটা পা টেনে টেনে হাঁটতো। কিন্তু বেঁচে তো গেল। তারপর কিছুদিন আমাদের বাড়িতে কাজও করেছিলে।

জাহিদ সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভাল মানুষরা বেশিদিন বেঁচে থাকে না মা, বুঝলি। তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন তোর মা। স্ট্রোক করল, কোমায় চলে গেল। আঠারো দিন থাকল জীবনমৃত্যুর মাঝখানে। তারপর চিরবিদায়। গতকাল সাতবছর পুরো হলো।

মৃত্যুর স্মৃতি পরিবেশ ভারি করে তোলে। এখনও তাই হলো। বাপ মেয়ে দুজনেই কেমন উদাস হয়ে গেল। বোধহয় এই অবস্থা কাটাবার জন্যই মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন জাহিদ সাহেব। তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে কিছু একটা যেন খেয়াল করার চেষ্টা করলেন।

বাবাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো শারমিন। কী দেখছ?

তোকে।

সঙ্গে সঙ্গে শারমিন তার স্বভাবসুলভ উচ্ছল ভঙ্গিতে বলল, আমাকে কেমন লাগছে বাবা?

ভাল, খুব ভাল। কিন্তু তোর সাজগোজের মধ্যে একটা খুঁত আছে।

কী?

তুই আজ টিপ পরিসনি। টিপ পরলে সাজটা বোধহয় কমপ্লিট হবে।

বুঝলাম। কিন্তু কমপ্লিট করে লাভ কী? সুন্দর সাজগোজ করে ঘরে বসে থাকার কোনও মানে আছে।

চল তাহলে বাইরে কোথাও যাই।

কোথায়?

তোকে বাইরে কোথাও খাইয়ে নিয়ে আসি।

শুনে আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল শারমিন। সত্যি? তাহলে শেরাটনে নিয়ে যাও বাবা। শেরাটনের পুলসাইটটা আমার খুব ভাল লাগে। ওখানে বসে দুজনে আমরা গল্প করব আর খাব।

আচ্ছা। তোকে আজ দুটো ঘটনার কথা বলব। একটা হচ্ছে তোর মায়ের মৃত্যুর সময়কার। তোর মা যখন কোমায়, হাসপাতালের বেডে না জীবিত না মৃত অবস্থায়, সে সময় একদিন ভোররাতে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখেছিলাম আমি। আমাদের এই উত্তরাতেই ঘটেছিল ঘটনাটা।

কী ঘটনা?

জাহিদ সাহেব মাত্র কথা বলবেন, তাঁর বেডসাইডে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। জাহিদ সাহেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। আমরা তাহলে সাড়ে বারোটার দিকে বেরুব।

শারমিনও উঠল। আচ্ছা।

তারপর বাবার রুমে না ঢুকে বারান্দা দিয়ে নিজের রুমে চলে এল। এসময় আবার মনে পড়ল সেই মানুষটির কথা। কেন শারমিনকে সে ফলো করছে? কী চায়? প্রেম! প্রেম কি এইভাবে পাওয়া যায়! এইভাবে হয়! গল্প উপন্যাস সিনেমা নাটকে হয়তো হয়। বাস্তবে কি হয়!

ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় অনেকগুলো টিপ লাগানো। যখন যেটা পরে এখান থেকে নিয়েই পরে শারমিন। খুলে এখানেই লাগিয়ে রাখে। আঠা শেষ হয়ে গেলে আপনাআপনিই ঝরে যায় কোনও কোনওটা। তখন নতুন টিপ বের করতে হয়।

কিন্তু এখন যেগুলো আছে সবগুলোই প্রায় নতুন।

মাঝারি সাইজের একটা টিপ নিয়ে পরল শারমিন। সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্য যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। সত্যি এখন যেন সাজটা তার কমপ্লিট হলো। আকাশি রংয়ের শাড়ি, লালটিপ, গোলাপের মতো সৌন্দর্য সবমিলিয়ে বসন্তরাতের একটুকরো চাঁদের আলো এসে যেন ঢুকে গেছে শারমিনের রুমে। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে শারমিন মনে মনে সেই মানুষটির উদ্দেশ্যে বলল, তোমার দুর্ভাগ্য, আজ আমাকে তুমি দেখতে পেলে না। দেখলে মাথা তো খারাপ হতোই, শুধু ইউনিভার্সিটিতে না আমাকে ফলো করতে করতে তুমি নিশ্চয় এই বাড়ি পর্যন্ত চলে আসতে। আমাদের বাড়ির সঙ্গের রাস্তার ওপাশে যে বকুলগাছ ওই বকুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমার রুমের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে, কখন একপলক দেখতে পাবে আমাকে।

কী রে, কী বলছিস মনে মনে?

চমকে পেছন ফিরে তাকাল শারমিন। নীলুফুফু কখন এসে ঢুকেছেন তার রুমে। হাসিমুখে ফুফুকে সে বলল, মনে মনে বলা কথা কি তুমি শুনতে পাও?

নীলু হাসলেন। হ্যাঁ, তোরটা পাই।

তাহলে বলো তো কী বলছিলাম?

বলছিলি তোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে সে দেখতে কেমন? কী করে? কোথায় থাকে!

বিয়ের কথা শুনে লজ্জা পেল শারমিন। ধুৎ। আমার মনের কথা তুমি কিছুই শুনতে পাওনি। আমি বলছিলাম একেবারেই উল্টোকথা।

কী বল তো!

এগিয়ে এসে দুহাতে ফুফুর গলা জড়িয়ে ধরল শারমিন। আমি বলছিলাম, এখন আমি ফুফুর কাছে যাব। গিয়ে বলব, ফুফু, আমি আজ ছোট্ট খুকি। তুমি আমাকে একটু কোলে নাও।

নীলু হাসলেন। ধুৎ পাগল মেয়ে।

নীলুর কথা পাত্তা দিল না শারমিন। শিশুর মতো আবদেরে গলায় বলল, ও ফুফু, নাও না আমাকে একটু কোলে। কতদিন তোমার কোলে চড়ি না।

তারপর আচমকা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

২

সেও এক বসন্তকালের কথা।

সৈয়দ মামাদের বাড়ির পশ্চিম দিককার মাঠে আলমগির মামার সঙ্গে গোল্লাছুট খেলতে গেছি। কত বয়স হবে আমার তখন! দশ! আলমগির মামাও আমার বয়সী। মার মেজোচাচার দ্বিতীয় পক্ষের ছোট ছেলে। খুবই দুরন্ত স্বভাবের, ডানপিটে ধরনের। আর আমি ছিলাম ন্যালাভোলা, গোলগাল, নিরীহ। কথা বলার স্বভাব তখন থেকেই কম। মুখে যত না বলি, মনে মনে বলি তারচে' হাজার গুণ।

তো সেই বিকেলে খেলতে খেলতে অকারণেই আমাকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল আলমগির মামা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আমার কোনও দোষ ছিল না তবু কেন ধাক্কাটা দিল?

তেমন ব্যথা আমি পাইনি কিন্তু রাগে ক্রোধে বুক ফেটে যাচ্ছিল। দুঃখও হচ্ছিল। কেন আমার সঙ্গে এমন করল আলমগির মামা!

না, আমি কাঁদিনি। মন খারাপ করে আলমগির মামার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আর খেলিওনি সেদিন। হয়তো সেই বিকেলেই ধাক্কা দেয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল আলমগির মামা। কিন্তু আমি ভুলিনি। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমার মনে পড়েছে সেই ধাক্কার কথা। বুকের ভেতর ফুঁসে উঠেছে রাগ, ক্রোধ।

কিন্তু ওই মুহূর্তে প্রতিবাদ আমি করিনি কেন? কেন আলমগির মামাকেও একটা ধাক্কা দিইনি! ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিইনি কেন? আমার গায়ে কি জোর কম ছিল! আলমগির মামার সঙ্গে কি আমি পারতাম না!

রাগ ক্রোধের সঙ্গে একথাও আমার বহুবার মনে হয়েছে। তবে সেই ধাক্কার প্রতিশোধ আমি নিয়েছিলাম, আলমগির মামাকে ধাক্কা দিয়ে কিংবা মারপিট করে নয়, অন্যভাবে। বেশ অনেকদিন পর, শীতের শুরুর দিকে।

বিকেলের মুখে মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আমরা দুজন। আমার পরনে ইংলিশপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি। আলমগির মামা পরেছে লুঙ্গি, খালি গা কিন্তু কাঁধের ওপর ফেলা একেবারেই নতুন একটা হাওয়াই শার্ট। ওই বয়সেই আলমগির মামার ভাবভঙ্গি চালচলন বড়দের মতো। মেয়েদের নিয়ে দুএকটি অসভ্য কথাও সে বলে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নতুন পুকুরের সামনে এসেছি আমরা, ভেতরবাড়ি থেকে মেজোনানার গম্ভীর গলার ডাক ভেসে এল। আলইমামা, ঐ আলইমামা।

নানাকে বাঘের মতো ভয় পেল আলমগির মামা। ডাক শুনে মুখটা শুকিয়ে গেল তার। এমন দিশেহারা হলো, দিকপাস না তাকিয়ে পাগলের মতো দৌড় দিল বাড়ির দিকে। দৌড়ের তালে শার্টটা যে পড়ে গেল কাঁধ থেকে, টেরই পেল না। মুহূর্তে ভেতর বাড়িতে উধাও হয়ে গেল।

আলমগির মামার শার্টের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতর ফুঁসে উঠল এক বিষাক্ত সাপ। রাগ ক্রোধ এবং অপমানের জ্বালায় ঘাঁ ঘাঁ করতে লাগল কানমুখ! কেন অমন করে আমাকে সে ধাক্কা দিয়েছিল? কী অন্যায় করেছিলাম আমি?

সেই নতুন হাওয়াই শার্টে আমি তারপর বেশ কয়েকটি বড় সাইজের মাটির ডেলা গিঁট দিয়ে বেঁধেছিলাম। পোটলার মতো করে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম নতুন পুকুরে। চোখের সামনে মুহূর্তে ডুবে গিয়েছিল আলমগির মামার শার্ট।

আশ্চর্য ব্যাপার, সেই মুহূর্তেই মনটা কেমন শান্ত হয়ে গেল আমার। বুকের ভেতর জমে থাকা রাগ ক্রোধ কোথায় মিলিয়ে গেল। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার অপমান মুহূর্তেই যেন ভুলে গেলাম আমি। আমার শুধু মনে হলো একটু অন্যরকমভাবে প্রতিশোধটা আমি নিতে পেরেছি। আলমগির মামার প্রিয় নতুন শার্ট এমনভাবে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি কেউ কোনওদিন সেই শার্টের হদিস পাবে না। আমি ছাড়া কেউ কোনওদিন জানবে না শার্টের পরিণতি।

খুবই প্রফুল্ল মন নিয়ে আমি তারপর মাঠের দিকে চলে গিয়েছিলাম। সেদিন আলমগির মামার সঙ্গে আমার আর দেখাই হয়নি। নানা বোধহয় কোথাও পাঠিয়েছিল তাকে। পরদিন খুবই চিন্তিত গলায় সে আমাকে বলল, আমার শার্টটা দেখছিলি মামু? দৌড়ের তালে কই যে পড়ল আর বিচড়াইয়া পাইলাম না। এই শার্টের লেইগা বাবায় যে আমারে কী পিডানডা পিডাইবো!

শুনে আমি দুঃখি দুঃখি মুখ করে বললাম, না তো! তর শার্ট তো আমি দেহি নাই। আহা রে, নতুন শার্টটা তুই হারালি কেমতে? অহন তো মাইর তর খাইতেই হইব।

দুদিন পরই সেই মারটা আলমগির মামা খেয়েছিল। গরু চড়াবার লাঠি দিয়ে আলমগির মামাকে পেটাতে পেটাতে নানা শুধু একটা গালই দিচ্ছিলেন বউয়ার পো, এমুন বাদাইরা তুমি হইছ, নতুন শার্ট হারাইয়া ফালাও, উদিস পাও না।

মেজোনানার প্রিয়গাল ছিল 'বউয়ার পো'। এই গালটার অর্থ খুব একটা খারাপ না। বউর ছেলে। আলমগির মামা তো যথার্থই তাই। আর 'বাদাইরা' মানে বেহিসেবি, 'উদিস' মানে টের পাওয়া। এগুলো বিক্রমপুরের শব্দ।

কিন্তু উঠোনে ফেলে আলমগির মামাকে যখন পিটাচ্ছিলেন নানা, বড়ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে, আর আলমগির মামার 'বাবা রে, গেছি রে, গেছি রে' টাইপের ত্রাহি চিৎকার শুনে আমার মনের ভেতরটা আশ্চর্য এক আনন্দে ভরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার সেই ধাক্কার একটি নয় দুটি বড় ধরনের প্রতিশোধ আমি নিতে পেরেছি। প্রথমত শার্টটা নষ্ট করে দিয়েছি, দ্বিতীয়ত নানার হাতে বেদম একটা মার খাওয়াতে পেরেছি।

জীবনে সেই ছিল আমার প্রথম প্রতিশোধ নেয়া।

কিন্তু শারমিনকে কোথাও দেখছি না কেন? না ক্লাশের দিকে যেতে, না করিডরে, না সিঁড়ির কাছে। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের এইসব জায়গাতেই তো কদিন ধরে দেখছি তাকে। তার সঙ্গের ছেলেমেয়েগুলোর কাউকে কাউকে দেখলাম। ক্লাশের দিকে যাচ্ছে কেউ, টিচার্স রুমের দিকে যাচ্ছে। দুটো মেয়েকে দেখলাম উচ্ছল ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এদের সঙ্গেই তো বেশির ভাগ সময় দেখি তাকে।

আজ কি সে ইউনিভার্সিটিতে আসেনি!

কেন আসেনি? শরীর খারাপ! জ্বর এলো! এসময় তো বাংলাদেশে খুব জ্বরজ্বারি হয়। বড়ভাইর ছেলেটার দুদিন ধরে বেশ জ্বর।

কিন্তু শারমিনের জ্বর একথা ভাবতে আমার ভাল লাগে না। কালও তো দেখলাম তাকে কী উচ্ছল ছটফটে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ফ্রেস একটি মেয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করছে, টিএসসিতে আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে। সঙ্গের একটি ছেলেকে দেখলাম হাসতে হাসতে বই দিয়ে খুব মারল। সেই মেয়ের জ্বর আসবে কেন?

না না জ্বর হয়নি শারমিনের। সে ভালই আছে। হয়তো ক্লাশে আসতে দেরি করছে কিংবা জরুরি কোনও ক্লাশ নেই দেখে টিএসসিতে গিয়ে বসে আছে। কয়েকমাস পর যেহেতু মাস্টার্স ফাইনাল, এসময় জরুরি ক্লাশ নাও থাকতে পারে।

আমি একটা সিগ্রেট ধরাই। তারপর টানতে টানতে টিএসসির দিকে হাঁটতে থাকি।

আমি বেশ ঘন ঘন সিগ্রেট খাই। চেইনস্মোকার। আমার ব্রান্ড মার্লবোরো। টোস্টেড মার্লবোরো। হার্ড সিগ্রেট। সব জায়গায় পাওয়া যায় না। বায়তুল মোকাররম নিউমার্কেট গুলশান এসব জায়গায় পাওয়া যায়। তিনদিন আগে এক কার্টুন কিনেছিলাম। আজ সকালে শেষ দুপ্যাকেট নিয়ে বেরিয়েছি। ফেরার সময় নিউমার্কেট থেকে এক কার্টুন কিনে নেব।

টিএসসিতে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, না শারমিন কোথাও নেই। তার বন্ধুবান্ধবও কাউকে দেখি না। তাহলে কি ভেতরে বসে চা সিঙারা খাচ্ছে ওরা!

কেন্টিনে ঢুকি। ভেতরে বেশ আগ্রহ কিন্তু মুখে খুবই নির্বিকার ধরনের একটা ভাব নিয়ে এ টেবিল ও টেবিলের দিকে তাকাই। না, শারমিন কোথাও নেই। দক্ষিণ দিককার কর্ণারের টেবিলে দেখি শারমিনের সেই দুই বান্ধবী বসে চা খাচ্ছে আর কী কথায় যেন খিলখিল করে হাসছে।

আমার আবার মনে হয়, শারমিন কি আজ সত্যি সত্যি ইউনিভার্সিটিতে আসেনি! কেন আসবে না? সে কি জানে না আমি তার জন্য অপেক্ষা করব! এখনও কি বোঝেনি একজন মানুষ নিঃশব্দে তাকে ফলো করছে! দূর থেকে তার প্রতিটি আচরণ খেয়াল করছে! মেয়েদের তো শুনেছি একটা তৃতীয় নয়ন থাকে। সেই নয়ন দিয়ে অন্যে দেখে না এমন অনেক কিছুই দেখতে পায় তারা! তাহলে আমাকে কি দেখতে পায়নি শারমিন!

আচ্ছা শারমিনের বান্ধবী দুজনকে কি জিজ্ঞেস করব শারমিন কোথায়? সে কি আজ ইউনিভার্সিটিতে আসেনি!

এটা কি ঠিক হবে?

শারমিনের কথা জিজ্ঞেস করলে ওরাও তো আমাকে অনেক প্রশ্ন করবে আপনি কে? কোন শারমিনের কথা জানতে চাইছেন! সে আপনার কে হয়! দুএকদিন ওদের সঙ্গে থাকার পরও শারমিনকে আমি ফলো করেছি। শারমিনের মতো ওরাও তো মেয়ে। ওদেরও তো তৃতীয় নয়ন থাকার কথা। ওরাও যদি খেয়াল করে থাকে আমাকে! যদি ওই নিয়ে কোনও প্রশ্ন করে!

আমার স্বভাবের মধ্যে দুটো ব্যাপারই সমানভাবে কাজ করে, না ভেবেচিন্তে হুট করে কোনও কোনও কাজ আমি করে ফেলতে পারি। আবার দশদিক ভেবেচিন্তেও কাজ করি।

আজ অনেকদিন পর মনে হলো না ভেবেচিন্তে দুএকটা কাজ করলে কী এমন ক্ষতি হবে! দুএকটা পাগলামোও তো জীবনে থাকা উচিত। দেখি না মেয়ে দুটোর সঙ্গে শারমিনকে নিয়ে একটু কথা বলে।

হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে এসেছে, সেই সিগ্রেট থেকে আরেকটা সিগ্রেট ধরালাম আমি। তারপর খুবই স্মার্টভঙ্গিতে মেয়ে দুটোর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক্সকিউজ মি!

দুজন একসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল।

এইসব মুহূর্তে মেয়েদের তাকানোর ভঙ্গিতে দুটো ব্যাপার কাজ করে। বেশ একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব আর বিরক্তি। যেন ইচ্ছে করে তাদেরকে কেউ ডিস্টার্ব করছে।

এই দুজনের চেহারায়ও তাই দেখা গেল। ব্যাপারটা আমি তেমন পাত্তা দিলাম না। সিগ্রেটে টান দিয়ে বললাম, আপনারা তো ইংলিশে পড়েন, না?

একজন একটু লম্বা ধরনের। বেশ কাটাকাটা চেহারা। গায়ের রং শ্যামলা। চেহারায় এক ধরনের রুক্ষতাও আছে। অন্যজন ফর্সা, গোলগাল, একটু মোটা ধাঁচের।

রুক্ষ চেহারার মেয়েটি বলল, জ্বি। কেন বলুন তো?

আমি আসলে একজনকে খুঁজছি। সে আপনাদের সঙ্গে পড়ে।

অন্য মেয়েটি বলল, কী নাম?

শারমিন হক।

শারমিন নামটা শুনে দুজনেই যেন একসঙ্গে চমকাল। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর রুক্ষ মেয়েটি বলল, আপনি জানলেন কী করে যে আমাদের সঙ্গে পড়ে?

ওর সঙ্গে আপনাদেরকে আমি দেখেছি।

ফর্সা মেয়েটি তখন মুখের সামনে দুতিনবার হাত নাড়ল। অর্থাৎ সিগ্রেটের ধোঁয়া সরাল। সঙ্গে সঙ্গে হাতের সিগ্রেট ফেলে পা দিয়ে পিষে দিলাম আমি। আইয়্যাম রিয়েলি সরি! সিগ্রেট খাওয়া ঠিক হচ্ছিল না।

আমার আচরণে ফর্সা মেয়েটি যেন একটু মুগ্ধ হলো। হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ শারমিন আমাদের সঙ্গে পড়ে। কিন্তু ও তো আজ ইউনিভার্সিটিতে আসেনি।

এইটুকুই জানার দরকার ছিল আমার। বললাম, তাই নাকি! কেন আসেনি জানেন? মানে আপনাদের কারও সঙ্গে কি কোনও যোগাযোগ হয়েছে। মানে শারমিনের শরীর খারাপ করেনি তো! এখন তো চারদিকে খুব ভাইরাল ফিবার টিবার হচ্ছে।

রুক্ষ মেয়েটি বলল, না কোনও যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু আপনি এত খোঁজ খবর নিচ্ছেন কেন। সে যে আপনার কোনও আত্মীয় নয় বুঝতে পারছি। আত্মীয় হলে খোঁজ খবর নিতে ওদের বাড়িতে চলে যেতেন কিংবা ফোন করতেন তা না করে ইউনিভার্সিটিতে এসেছেন খোঁজ নিতে। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন। আপনার আসলে ব্যাপারটা কী?

এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমি কখনও পড়িনি। কী বলব বুঝতে পারছি না। হুট করে পাগলামো করতে এসে তো ধরা খেয়ে গেলাম!

ফর্সা মেয়েটি স্নিগ্ধচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত কয়েক কিছু ভাবলাম আমি। তারপর হাসিমুখে বললাম, আসলে ব্যাপার তেমন কিছুই না। আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না আমি জানি না, তবু আমি মিথ্যে বলছি না, মিথ্যে বলার স্বভাব আমার নেই, আমার ছোটখাটো একটা এডফার্ম আছে। একটি কসমেটিকস কোম্পানির এডের কাজ পেয়েছি আমি। সেই কোম্পানির প্রধান শর্ত হলো তারা কোনও তথাকথিত পরিচিত ফেস কিংবা পপুলার মডেল নেবে না....

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ফর্সা মেয়েটি বলল, আপনি বসুন না। বসে কথা বলুন।

থ্যাংকস।

টেবিলের দুপাশে দুজন আমি বসলাম তৃতীয় পাশটায়। বাই দা বাই, আমার নাম মাহি। মাহি খান।

এতক্ষণে রুক্ষ মেয়েটিও একটু যেন স্বাভাবিক হয়েছে। ফর্সা মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, ওর নাম ঝিনুক আর আমি তৃণা।

দুটোই খুব সুন্দর নাম। তারপর যা বলছিলাম, যেহেতু ওরা নিউ ফেস চায় সেই কারণে আমি দু-তিনদিন ধরে ইউনিভার্সিটিতে আসছি। যদি তেমন কাউকে পছন্দ হয় তাকে অফার করব।

ঝিনুক বলল, তার মানে শারমিনকে আপনার পছন্দ হয়েছে! ও হওয়ারই কথা। শারমিন তো খুব সুন্দর।

তৃণা বলল, কিন্তু ওর নাম আপনি জানলেন কী করে?

আরে, এই মেয়েটা তো বেশ ট্যাটনা টাইপের দেখছি! উকিলদের মতো প্রশ্ন করে!

তবু হাসিমুখে উত্তরটা আমি দিলাম। এটা কি খুব কঠিন কোনও কাজ বলুন! আপনাদের এক বন্ধুর কাছ থেকেই ট্যাক্টয়ালি জেনে নিয়েছি।

কোন বন্ধু?

তার নাম আমি জানি না। সরি। তবে সে ছেলে। যাহোক দু-তিনদিন ধরে ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে ঘুরে অনেককেই দেখলাম কিন্তু শারমিনকেই আমার পছন্দ হলো। ভাবলাম আজ তার সঙ্গে কথা বলব আর দেখুন আজই সে এল না।

ঝিনুক বলল, কিন্তু মডেলিং ও করবে বলে আমার মনে হয় না।

কেন বলুন তো?

ও এসব পছন্দ করে না।

কিন্তু আজকাল অনেকেই মডেলিং করছে! আমি প্রথমে ভেবেছিলাম 'নতুন মুখ চাই' বা এই জাতীয় একটা এড দেব পেপারে। শুনে আমার একজন এক্সিকিউটিভ বলল, এই কাজও করবেন না স্যার। তাহলে শয়ে শয়ে মেয়ে এসে হাজির হবে। হাজার হাজার চিঠি এবং ছবি আসবে। আরেক বদারেসান্স।

মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণচোখে তৃণা আমাকে দেখছিল। বুঝতে পারি আমার সবকথা সে বিশ্বাস করছে না। তার মধ্যে একটা সন্দেহ কাজ করছে।

করুক। আমার কি! আমার যা জানার ছিল তাতো আমি জেনেই ফেলেছি। শারমিন আজ ইউনিভার্সিটিতে আসেনি।

কিন্তু কিছু একটা বলে তো তৃণা এবং ঝিনুকের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। কী বলব?

ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনারা আমাকে একটু হেল্প করবেন। শারমিনদের ফোন নাম্বার কিংবা বাড়ির এড্রেসটা দেবেন। আমি তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করি।

ঝিনুক কথা বলবার আগেই তৃণা বলল, শারমিনকে না বলে সেটা আমাদের দেয়া ঠিক হবে না। তারচে' আপনি বরং আপনার একটা কার্ড দিন আমরা শারমিনকে দিয়ে দেব এবং ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। সে যদি ইন্টারেস্টেড হয় তাহলে আপনাকে ফোন করবে। আর যদি ফোন না করে, ধরে নিতে হবে সে ইন্টারেস্টেড না।

তৃণার কথাবার্তা শুনে ভেতরে ভেতরে খুবই বিরক্ত আমি। বিক্রমপুরের ভাষায় মনে মনে মোটামুটি ভদ্রগোছের দু-তিনটা গাল দিয়ে দিলাম। তর চেহারা দেখলেই বুঝা যায় তুই যে বহুত ট্যাটনা। বিয়া হইলে জামাইর হালুয়া তুই টাইট কইরা ছাড়বি। যেই বেডা তরে বিয়া করব ওর জিন্দেগি ছেড়াভেড়া। তর লাহান ছেমড়ি শারমিনের বান্ধবী হইলি কেমতে!

কিন্তু মুখটা খুবই হাসি হাসি আমার। বিনয়ের অবতার হয়ে বললাম, সরি। আমার সঙ্গে আজ কার্ড নেই। মানিব্যাগে কার্ড রাখি। দু-তিনদিন আগে শেষ হয়েছে নতুন করে রাখতে মনে নেই। একটা কাজ করুন, আমার সেল নাম্বারটা, সরি মোবাইল নাম্বারটা রাখুন। ওটা শারমিনকে দিয়ে দেবেন।

তৃণা নয়, আমার নাম্বার লিখে রাখল ঝিনুক।

টিএসসি থেকে বেরিয়ে প্রথমে আমি একটা হাপ ছাড়লাম তারপর সিগ্রেট ধরালাম। ইস, বানিয়ে বানিয়ে এত কথা বলা যায়! তবে বলেছি খুব স্মার্টলি। হঠাৎ করেই এড কোম্পানি মডেলিং এসব মাথায় আসার ফলে বেশ জমে গিয়েছিল গল্পটা। একটুও নার্ভাস না হয়ে বেশ চালিয়ে গেলাম। ঝিনুক কিংবা তৃণার বোঝার কোনও উপায়ই ছিল না যে পুরো ব্যাপারটাই ফলস, বানোয়াট।

কিন্তু শারমিন আজ ইউনিভার্সিটিতে আসেনি কেন? কী হয়েছে তার? সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি তো!

শারমিনের দুটো ছবি আছে আমার কাছে। বি টু সাইজের। একটা আকাশি রংয়ের সালোয়ার কামিজ পরা আরেকটা ফিরোজা রংয়ের শাড়ি পরা। সালোয়ার কামিজ পরা ছবিটা অসাধারণ। সেটা আমি আমার পাসপোর্টের ভেতর, স্যুটকেসে রেখে দিয়েছি। অন্য ছবিটা গলার কাছ থেকে সুন্দর করে কেটে শুধু ফেসটা আমেরিকান ভিসার জন্য যে সাইজের ছবি লাগে সেই সাইজ করে নিয়েছি। এই সাইজের ছবি মানিব্যাগের গোপন পকেটে রাখতে সুবিধা।

মানিব্যাগ থেকে ছবিটা আমি বের করলাম। অসাধারণ মিষ্টি চেহারার শারমিন গজদাঁত বের করে হাসছে। আর তাকানোটা এমন, যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সেই ছবির দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম, শারমিন, তোমার কী হয়েছে? ইউনিভার্সিটিতে আসনি কেন? তুমি কি জান না আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব!

তখন দ্বিতীয় পাগলামোটা খেলে গেল আমার মনে। আচ্ছা শারমিনকে ফোন করলে কেমন হয়! ঝিনুক তৃণার সঙ্গে চালাকি করে শারমিনের ফোন নাম্বার চেয়েছিলাম, আসলে ফোন নাম্বার এড্রেস সবই তো আছে আমার কাছে।

কিন্তু ফোন যদি অন্য কেউ ধরে?

সেটাই তো স্বাভাবিক। শারমিনই যে ফোন ধরবে তেমন তো কোনও কথা নেই। যে ইচ্ছে ধরুক, সরাসরি শারমিনকে চাইব। পরিচয় জানতে চাইলে নামটা ঠিক বলে এডফার্মের গল্পটা চালিয়ে দেব, ঝিনুক তৃণার সঙ্গে যেমন চালিয়েছি। তারপর শারমিন ফোন ধরলে....

শারমিনকে কী বলব সেকথা আমার আর মনে আসে না। সিগ্রেট টানতে টানতে শাহবাগের দিকে হাঁটতে থাকি।

শাহবাগের কোণে পিজি হাসপাতালের মুখে দু-তিনটি ফোন ফ্যাক্সের দোকান। একটা দোকানে ঢুকে শারমিনদের বাড়িতে ফোন করি। শারমিনের ছবি, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস ইত্যাদি পাওয়ার পর আজই তাকে প্রথম ফোন করা। আমার হিসেবটা ছিল এই রকম যে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে প্রথমে তাকে আমি দূর থেকে কাছ থেকে দেখব। ছবির সঙ্গে কতটা মিল তার, কতটা অমিল। তার আচার-আচরণ চলাফেরা কেমন। কোন ধরনের ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে মেশে। দেখে স্যাটিসফাইড হলে ফোন করব, কথা বলব। তারপর সরাসরি একদিন সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

প্রথম পর্বটা আমি শেষ করেছি। তারপরও আজই ফোন করার কোনও প্ল্যান আমার ছিল না। ইউনিভার্সিটিতে এসে শারমিনকে না পেয়ে মনের ভেতর চাড়া দিয়ে উঠল পাগলামো। ঝিনুক ও তৃণার সঙ্গে কথা বললাম। এখন ফোন করছি।

ফোন ধরল একটা ছেলে। গলার আওয়াজে বোঝা গেল কিশোর বয়সী হবে এবং ভাষায় বোঝা গেল বাড়ির কাজের ছেলে।

হ্যালু, কারে চান?

এটা কি জাহিদুল হক সাহেবের বাড়ি।

জ্বে।

শারমিন আছে?

জ্বে না। নাই।

কোথায় গেছে?

কইতে পারি না। আপনে কে?

প্রশ্নটার উত্তর আমি এড়িয়ে যাই। কখন বেরিয়েছে বলতে পার? মানে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছে নাকি অন্য কোথাও?

ছেলেটা এবার বেশ গম্ভীর হলো। কিন্তু আপনে কে সেইটা বলতাছেন না ক্যান? সেইটা না বললে তো আপনার কথার আমি জবাব দেব না।

বুঝে গেলাম ছোকড়াটা তৃণা টাইপের। ট্যাটনা। আমি কি এখন আমার নাম বলে, মিথ্যে বানোয়াট পরিচয় দিয়ে ওর কাছ থেকে কথা বের করব! সেটা কী এমন কঠিন কাজ!

গম্ভীর গলায় বললাম, এই ছেলে, তুমি যে এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তুমি জানো আমি কে? আমি শারমিনের মামাতো ভাই। আমার নাম...

নাম বলার আগেই বেশ নার্ভাস গলায় ছেলেটা বলল, তয় আপনে ফুবুআম্মার সঙ্গে কথা বলেন।

বলেই ফোন নামিয়ে রেখে ফুবুআম্মা, ফুবুআম্মা বলে চিৎকার করে কাকে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা আমি কেটে দিলাম। এখন নিশ্চয় শারমিনের নীলুফুফু এসে ফোন ধরবেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগবে না।

ততোক্ষণে বেশ দুপুর। খিদে পেয়েছে আমার। একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে বিফবার্গার আর কোক খেলাম। খেতে খেতেই মাথায় তৃতীয় পাগলামোটা এল আমার। আমি এখন শারমিনদের বাড়িতে যাব।

পিজির গেটের সামনে রিকশা সিএনজি ট্যাক্সিক্যাব সবই আছে। আমি একটা কালো রংয়ের ট্যাক্সিক্যাবে চড়ি। উত্তরা যান।

উত্তরা নামটি বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর আশ্চর্য এক অনুভূতি হয় আমার। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা মনে পড়ে।

৩

আমি তোর বিয়ের কথা ভাবছি।

গভীর মনোযোগ দিয়ে মেনু দেখছিল শারমিন। বাবার কথা শুনে চমকে চোখ তুলে তাকাল। যেন কথাটা সে শুনতে পায়নি এমন গলায় বলল, কী বললে?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। তুই বড় হয়ে গেছিস!

এতে হাসির কী হলো?

না হাসছি অন্য কথা ভেবে।

কী কথা?

আগের দিনের লোকেরা নামের শেষে শিক্ষাগত যোগ্যতাটা লাগিয়ে দিত। অমুক রহমান, বি এ। অনার্স থাকলে ব্রাকেটে আবার অনার্সটা লাগাত। কয়েক মাস পর তুই হচ্ছিস শারমিন হক, এম এ।

এবার শারমিনও হাসল। ব্রাকেটে অনার্সটা লাগাও। অনার্সে এত ভাল রেজাল্ট আমার আর সেটা তুমি লাগাবে না!

আচ্ছা লাগালাম।

এবার ঝেরে কাশো। মানে পরিষ্কার করে বলো কী বলছিলে!

আগে খাবারের অর্ডার দে।

কাউন্টারের দিকে স্লিপপ্যাড হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন ওয়েটার। আড়চোখে শারমিনের দিকে তাকাচ্ছে। আচরণে বোঝা যায় শারমিনের অর্ডার নেয়ার জন্য ভেতরে ভেতরে বেশ উদগ্রিব সে।

হাত ইসারায় লোকটিকে ডাকল শারমিন। মুহূর্তে ছুটে এল সে। খাবারের অর্ডার দিল শারমিন। কিন্তু আইটেম যেন কম মনে হলো জাহিদ সাহেবের। বললেন, এত কম অর্ডার দিলি কেন?

কম কোথায়? চারটা আইটেম।

সবই তো মনে হলো ফিস।

হ্যাঁ। প্রণ, পসফ্রেটস আর মেন্ডারিন ফিস। তুমি বলেছ আমার যা পছন্দ তাই খাবে। ভেজিটেবল রাইসের সঙ্গে এই তিনটে ফিসই খুব ভাল লাগবে।

তা বুঝলাম। দু-একটা মাংসের আইটেম দিলেও পারতি।

শারমিন গম্ভীর গলায় বলল, বাবা, তুমিই আমাকে শিখিয়েছ মাছ এবং মাংস একসঙ্গে খেতে হয় না। আমাদের বাড়িতে কোনও দিনও মাছ আর মাংস একদিনে রান্না হয় না। যেদিন মাছ হবে, শুধু মাছ। আর যেদিন মাংস শুধুই মাংস। সঙ্গে কমন আইটেম সবজি আর ডাল।

আজ একটু অনিয়ম হলেও অসুবিধা নেই।

তা না হয় বুঝলাম কিন্তু দুজন মানুষ কত খাব! আর অপচয় আমি পছন্দ করি না।

ঠিক আছে। সফট ড্রিংকস দিতে বল। খাবারের আগে গলাটা একটু ভেজাই।

নিজের জন্য কোক আর বাবার জন্য স্প্রাইট দিতে বলল শারমিন। তারপর বাবার দিকে তাকাল। এবার বলো।

মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন জাহিদ সাহেব। আবার বললেন, আমি তোর বিয়ের কথা ভাবছি।

বাবার মুখে সরাসরি নিজের বিয়ের কথা, শারমিন যেন একটু লজ্জা পেল। যদিও বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুর মতো, বাপ মেয়ে সাধারণত বলে না এমন কথাও তারা দুজন কখনও কখনও বলে। তবু এই মুহূর্তে শারমিন যেন একটু লজ্জা পেল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মুখটা সে নিচু করে রাখল, লজ্জাটা কাটাল, তারপর মুখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। অতি সহজ সরল গলায়, যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, মেয়ে বড় হলে সব বাবা-মাই তার বিয়ের কথা ভাবে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তুমি কি শুধুই ভেবেছ না এগিয়েছ?

কিছুটা এগিয়েছি।

মানে ঘটক লাগিয়েছ?

ঠিক ঘটক না। প্রফেশনাল ঘটক আমার পছন্দ না। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক, মানে একজন প্রকাশক, তুই তাকে দেখেছিস কিন্তু মনে আছে কি না আমি জানি না, খান সাহেব, সে একটা সম্বন্ধ এনেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটার কথা মনে পড়ল শারমিনের। কেন, সে একদমই বুঝতে পারল না। একটু আনমনা হল।

শারমিনের আনমনা ভাবটা খেয়াল করলেন জাহিদ সাহেব। বললেন, তোর মা বেঁচে থাকলে আমার অনেক সুবিধা হতো।

শারমিন অবাক হল। কেমন?

যেসব কথা আমার বলতে হচ্ছে এসব তোর মা বলতেন।

তুমিও বলতে পার। কোনও অসুবিধা নেই।

অবশ্য নীলুকে দিয়েও বলাতে পারতাম।

কোনও দরকার নেই বাবা। আমি তেমন পুতুপুতু স্বভাবের মেয়ে নই, তুমিও পুরনো দিনের বাবা নও। সবকিছু আমাকে সহজ করে বলো। আমারও যদি তোমাকে কিছু বলার থাকে বলব।

গুড, ভেরি গুড। ছেলেটি সম্পর্কে আমি পরে বলি তার আগে তোর কাছ থেকে দু-একটি কথা আমার জানা দরকার।

শারমিন হাসল। আমি জানি তুমি কী জানতে চাইবে। প্রশ্ন করবার দরকার নেই, উত্তরটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। আমার নিজের কাউকে পছন্দ নেই, কোনও ভাল লাগা, এফেয়ার টেফেয়ার কিচ্ছু নেই। তুমি নিজেও বেশ ভাল করেই জানো তোমার পছন্দেই আমি বিয়ে করব। তোমার কথার বাইরে আমি যাব না।

মেয়ের কথা শুনে এতটাই মুগ্ধ হলেন জাহিদ সাহেব, হাত বাড়িয়ে মেয়ের গালটা একটু ছুঁয়ে দিলেন। শিশুকে আদর করার গলায় বললেন, ওরে আমার মেয়েটা! আমি খুব খুশি হয়েছি মা। খুব খুশি হয়েছি।

এ সময় কোক স্প্রাইট এল, দুজনে প্রায় একসঙ্গে গ্লাসে চুমুক দিল।

জাহিদ সাহেব বললেন, এবার তাহলে ছেলেটার কথা বলি।

শারমিন কথা বলল না।

জাহিদ সাহেব বললেন, তার আগে তোর পারমিশান নিয়ে একটা সিগারেট খেতে পারি?

শারমিন চোখ পাকিয়ে বাবার দিকে তাকাল। না।

আমি তো রেগুলার খাচ্ছি না। একদিন খেলে কী হবে?

না। বদ অভ্যেস একটু একটু করেই হয়। আজ একটা খেলে কাল দুটো খেতে ইচ্ছা করবে। এভাবে অভ্যাস হয়ে যাবে।

আরে না। তুই পছন্দ করিস না এমন কাজ আমি কখনই করব না।

মানুষ অভ্যাসের দাস। অভ্যাস বদলানো খুব কঠিন। যা ছেড়েছ তা আর ধরা ঠিক হবে না। আবার যদি ধরো, দেখা গেল আগের চেয়ে বেশি খেতে শুরু করেছ। আমার ভয়ে বাইরে গিয়ে খাচ্ছ। বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ। মোবারককে দিয়ে একটা দুটো করে আনাচ্ছ।

না তেমন আর হবে না।

হতে পারে।

আচ্ছা ঠিক আছে। খেলাম না।

সবচে' বড় কথা সিগ্রেটের গন্ধ আমার

ভাল লাগে না।

অথচ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে মেয়েরা আজকাল বেশি সিগ্রেট খাচ্ছে।

খাক গিয়ে।

দুজনেই একটু থামল।

শারমিনের তখন ভেতরে ভেতরে বেশ একটা অস্থিরতা চলছে। কথাটা পরিষ্কার করে বলছে না কেন বাবা! কেমন সমন্ধ এনেছেন খান সাহেব। ছেলেটা করে কী? পড়াশুনা কতদূর, দেখতে কেমন, ফ্যামিলি কেমন, এসব জানার জন্য শারমিন যে উদ্‌গ্রীব হয়েছে বাবা কি তা বুঝতে পারছে না! এরকম একটি কথা বেশিক্ষণ না বলে সে থাকছেই বা কেমন করে!

বাবা অবশ্য শারমিনের মতো অস্থির ধরনের মানুষ নয়। ধীর-স্থির শান্ত স্বভাবের। যে কোনও কাজ দশবার ভেবেচিন্তে করে।

তা করুক গে। কিন্তু এখন শারমিনকে এমন সাসপেনসের মধ্যে রেখেছে কেন? বলছে না কেন কথাগুলো!

মেয়ের মনের অবস্থাটা যেন এসময় বুঝতে পারলেন জাহিদ সাহেব। হাসিমুখে বললেন, তোর খুব অস্থির লাগছে, না?

শারমিন হাসল। তোমার কি মনে হয়? লাগবার কথা না?

হ্যাঁ। তোর জায়গায় আমি হলে আমারও লাগতো।

তাহলে বলে ফেল।

ছেলেটির নাম গালিব। গালিব আহসান চৌধুরী। গুলশানে নিজেদের বাড়ি। ব্যাঙ্গালোর থেকে এমবিএ করেছে। বাবার শিপিং বিজনেস। অয়েলট্যাঙ্কার কারগো, বরিশাল পটুয়াখালী যাওয়ার দোতলা বিশাল বিশাল লঞ্চ আছে চার পাঁচটা। তিনভাই দুবোন। দুবোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। গালিব সবার ছোট। বাবা এখন বিজনেস দেখে না। দুই বোনজামাই, বড় দুইভাই এবং গালিব এই পাঁচজনেই দেখাশোনা করে। মতিঝিলে অফিস আছে। গালিব সেই অফিসে বসে।

হাইট কেমন? বেঁটে ফেটে না তো?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। আমি জানতাম এই প্রশ্নটাই তুই প্রথমে করবি। খান সাহেবকে আমিও প্রথমেই বলেছিলাম ছেলের হাইট কেমন? কালো ফর্সা কিংবা শ্যামলা গায়ের রং নিয়ে আমার কোনও কথা নেই, কথা ওই হাইট নিয়ে। বেঁটে মানুষ দুই চোখে দেখতে পারে না আমার মেয়ে।

খান আংকেল কী বললেন?

আমার কথা শুনে হাসলেন। আমি জানি আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেঁটে পছন্দ করে না। গালিবের হাইট খুব ভাল। পাঁচ ফিট দশ।

শুনে স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলল শারমিন। কথা বলল না।

জাহিদ সাহেব বললেন, হাইট ঠিক আছে না?

খুব যে ঠিক আছে তা নয়। আজকালকার ছেলেরা ছয় দুই তিন এমনকি চার সোয়া চারও হচ্ছে। অনেক লম্বা মেয়েও দেখা যায় এখন।

তা যায় কিন্তু তোর সঙ্গে মানানসই তো হতে হবে। অমিতাভ বচ্চন আর জয়া ভাদুড়ির মতো হলে তো হবে না।

শারমিন চোখ পাকিয়ে বাবার দিকে তাকাল। এই, আমি কি জয়া ভাদুড়ির মতো অত বেঁটে?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। আরে না। তোর হাইট যথেষ্ট ভাল। বাঙালি মেয়ে হিসেবে পাঁচ পাঁচ ভাল হাইট।

জাহিদ সাহেব স্প্রাইটে চুমুক দিলেন।

শারমিন অস্থির গলায় বলল, কিন্তু খাবার দিচ্ছে না কেন? এত দেরি করছে কেন?

এক্ষুণি দেব মা। কোক খা।

আমার কোক তো শেষ।

কখন শেষ করলি?

শারমিন হাসল। কথার তালে ছিলাম। নিজেও বুঝতে পারিনি।

আর একটা দিতে বলব?

না। কোকে খুব ফ্যাট।

কিন্তু আমি জানি তুই খুব পছন্দ করিস।

তা করি।

তাহলে খা আর একটা। একদিন দুটো কোক খেলে কিচ্ছু হবে না। কাল না খেলেই হবে।

তোমার কি ধারণা আমি রোজ কোক খাই?

ধারণা না, তুই যে খাস তা আমি জানি।

কেমন করে জানো?

যাকে দিয়ে আনাস সেই বলেছে।

মোবারক। দাঁড়াও, বাড়ি গিয়ে আজ ওকে একটা গুতা দেব।

এসময় খাবার নিয়ে এল ওয়েটার।

জাহিদ সাহেব বললেন, আর একটা কোক দেবেন।

শারমিন তখন বাবার প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছে।

জাহিদ সাহেব বললেন, ছেলেটির ছবি টবি কিচ্ছু আমি দেখিনি। তবে সব শুনে আমার ভাল লেগেছে। শিক্ষিত, টাকা পয়সাঅলা ভাল ঘরের ছেলে। ভাইবোনগুলো, দুই বোনজামাই সবাই লেখাপড়া জানা। এক বোন ডাক্তার আরেক বোন ভিকারুননিসা নূনের ইংরেজির টিচার। বড় ভাই মাস্টার্স করেছে ম্যানেজম্যান্টে। মেজোটা একাউনটিংয়ে। খান সাহেব বললেন, ওরা কেউ তেমন ফর্সা না, শ্যামলা ধরনের রং সবার। তবে চেহারা টেহারা ভাল।

শুনে শারমিন মনে মনে বলল, ফর্সা রংয়ের পুরুষ আমার একদম পছন্দ না। কেমন আলু মুলার মতো লাগে। আমি পছন্দ করি ডার্ক, ম্যানলি পুরুষ।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটির কথা মনে পড়ল শারমিনের। সেও বেশ লম্বা, গায়ের রং কালোর দিকেই বলা যায়, আর বেশ ম্যানলি। চালচলন একেবারেই কেয়ারলেস টাইপের।

মানুষটির উদ্দেশ্যে শারমিন মনে মনে বলল, তোমার আর কোনও চান্স নেই গো! মির্জা গালিব আমাকে বোধহয় নিয়েই যাচ্ছে।

জাহিদ সাহেব খেতে খেতে বললেন, কী ভাবছিস?

মুখের খাবার শেষ করে শারমিন বলল, না কিছু না।

গালিবকে কেমন লাগল?

আচমকা এরকম একটা প্রশ্ন, শারমিন চমকাল। কেমন লাগল মানে? আমি দেখেছি নাকি?

না মানে আমার কাছ থেকে শুনে!

আমার কিছু বলার নেই। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই।

আমার কিন্তু পছন্দ।

তা আমি বুঝেছি।

আমি কি তাহলে আগাবো?

তোমার ইচ্ছা।

তবে তোকে যে তাদের পছন্দ হবে এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

কী করে বুঝলে।

আমি জানি, আমার মেয়ে খুব সুন্দর।

নিজের মেয়েকে সব বাবারই সুন্দর মনে হয়।

এটা ঠিক না।

কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে জানিস?

কী?

তোর দুটো ছবি আর বায়োডাটা চেয়েছিল ওরা। খান সাহেবকে দিয়েও ছিলাম। আজ সকালে ফোন করে খান সাহেব বললেন, খামটা নাকি সে খুঁজে পাচ্ছে না।

বলো কী? হারিয়ে ফেলেছে?

তাই তো বলল।

খুবই ইরেসপনসেবল লোক দেখছি।

এভাবে বলিস না। সে তো আর ইচ্ছে করে হারায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভাল হয়নি বাবা। আজকাল কত ধরনের ধান্দাবাজ লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। তেমন কারও হাতে যদি আমার ছবি আর বায়োডাটা যায়, আমাকে যদি কেউ ব্লাকমেইল করে!

আরে না। কী ব্লাকমেইল করবে?

তুমি জানো না, করতে পারে।

মেয়ের প্লেটে দুটো চিংড়ি তুলে দিলেন জাহিদ সাহেব। ওসব নিয়ে তুই ভাবিস না

তো!

আচ্ছা ঠিক আছে ভাবব না। কিন্তু তুমি আমার ছবি পেলে কোথায়?

তোর এ্যালবাম থেকে নিয়েছি।

কই আমাকে তো কিছুই বলনি।

বলিনি ইচ্ছে করেই। ভেবেছি আগে ওদের সঙ্গে কথাটথা হোক তারপর বলব।

এখনও তো কথা হয়নি, আজ তাহলে বললে কেন?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। ছবির জন্য।

মানে?

তোর আরও দুটো ছবি আমার লাগবে। আমার অফিসের কম্পিউটারে তোর বায়োডাটা আছে। সেখান থেকে একটা প্রিন্ট বের করে নেব। এখন তোর দুটো ছবি হলে দু-একদিনের মধ্যে খান সাহেবকে আবার পাঠাতে পারি।

আমাকে না বলেও তো ছবি নিয়ে নিতে পারতে।

তা পারতাম। আগেরবার ছবি বের করে দিয়েছিল নীলু। সেই ছবি হারিয়ে গেছে শুনে সেও কেমন একটু ভয় পেয়েছে। বললাম শারমিনের এ্যালবাম থেকে আরও দুটো ছবি এনে দে। শুনে বলল, আমি আর পারব না। পরে যখন তোমার মেয়ে সব শুনবে, আমাকে একদম খেয়ে ফেলবে। তখনই ডিসিশান নিলাম তোকে সব বলে দেব। তারপর তোর কাছ থেকেই ছবি চেয়ে নেব।

শারমিন এক চুমুক কোক খেল। তারপর মিষ্টি করে হাসল। এজন্যই আজ এখানে খাওয়াতে নিয়ে এসেছ।

জাহিদ সাহেবও হাসলেন। আরে না।

আমি ঠিকই বুঝেছি। আচ্ছা যাও, ঠিক আছে। ছবি তোমাকে আমি দেব। থ্রিআর সাইজ, পাসপোর্ট সাইজ, যা চাও। আর যদি আমার আগের হারিয়ে যাওয়া ছবি নিয়ে কোনও ঝামেলা হয় সেই ঝামেলার জন্য কিন্তু তুমি আর খান আংকেল দায়ী থাকবে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আবার কিছুটা সময় কাটে চুপচাপ। জাহিদ সাহেব খেতে খেতে কেমন উদাস হয়ে যান।

ব্যাপারটা খেয়াল করল শারমিন। বলল, কী ভাবছ বাবা?

অন্য একটা ঘটনার কথা ভাবছি।

কী বলো তো?

সকালবেলা তোকে আজ বলেছিলাম না, দুটো ঘটনার কথা বলব! একটা তো বলে ফেললাম। তোর বিয়ে, ছবি ইত্যাদি। অন্যটাও বলে ফেলি। কেন যে কাল থেকে ঘটনাটা থেকে থেকে মনে পড়ছে। তোর মায়ের মৃত্যুদিন ছিল বলেই হয়তো মনে পড়ছে। তোর মায়ের মৃত্যুদিনের ভোরবেলাই ঘটেছিল ঘটনাটা। সাত বছর আগে। ঠিক ভোরবেলা না, ভোর রাত বলতে পারিস। তখনও ফজরের আজান হয়নি। চারটা পাঁচ দশ মিনিট হবে। উত্তরায় আমাদের বাড়ির সামনেই ঘটেছিল।

ইস বাবা, তুমি মাঝে মাঝে এত রহস্য করে কথা বলো। এত সময় নিচ্ছ কেন বলতে। সহজ ভাষায় চট করে বলে ফেললেই তো হয়।

হ্যাঁ বলছি। ভোররাতে হাসপাতাল থেকে ফোন এল, তোর মার অবস্থা বেশ খারাপ। নীলু ছিল তোর মায়ের কাছে। সে কাঁদতে কাঁদতে ফোন করল। ভাইজান, তুমি এক্ষুণি আস। ভাবীর শরীর খুবই খারাপ। ফোন পেয়ে আমি দিশেহারার মতো বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আমাদের তখন গাড়ি নেই। বাড়ি একতলা হয়েছে। দোতলার কাজ চলছে। তোর মার কথায়ই একতলা কমপ্লিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে এসে উঠেছিলাম আমরা। তাতে সুবিধাই হয়েছিল। বাড়িতে থেকেই বাড়ির কাজ তদারক করতে পারছিলাম। কিন্তু ভোররাতে উত্তরা থেকে ঢাকা মেডিকেলে কেমন করে যাব। তবু দিশেহারার মতো বেরিয়েছি। মেইনরোডে গিয়ে রিকশা স্কুটার যা পাই নিয়ে নেব। ভাড়া যা নেয় নেবে। উত্তরা তখন বেশ ফাঁকা এলাকা। এত বাড়ি টারি তৈরি হয়নি। তবে হচ্ছে। এদিক ওদিক তাকালেই আন্ডার কনস্ট্রাকশন বাড়ি দেখা যায় প্রচুর। শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আমি। কোনওদিকে খেয়াল নেই। দিশেহারার মতো ছুটছি। হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ি বরাবর লেকের পাড়ের আবছা অন্ধকারে দুজন মানুষ একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে টালমাটাল পায়ে হাঁটছে। খানিকদূর গিয়ে লেকের ভাঙনের দিকে নেমে গেল তারা। শুধু এটুকুই আমি দেখলাম। তারপর আমার আর কিছু চোখে পড়েনি বা খেয়াল করিনি। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছে, রিকশা স্কুটার পাব কী পাব না জানি না, এই অবস্থায় অন্যকিছু কি আর খেয়াল থাকে! সেদিনই সকালবেলা তোর মা মারা গেলেন। লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম দশটার দিকে। আত্মীয়স্বজনরা সবাই এসেছে। কান্নাকাটি বিলাপ চলছে বাড়িতে। ওই দৃশ্যটির কথা আমার আর মনেই নেই। তোর মাকে মাটি দিয়ে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে দেখি লেকের ওদিকটায় লোকজনের জটলা। পুলিশ এসেছে। কী ব্যাপার? লেকের ওদিকটায় একজন আধবুড়ো লোকের লাশ ভাসছে। তার হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা।

শুনে চমকে উঠল শারমিন। বলো কী!

হ্যাঁ। দড়ি দিয়ে বেঁধে লেকে ফেলে দেয়া হয়েছিল তাকে। যাতে নড়তে চড়তে না পারে। একবারেই ডুবে যায়।

তার মানে ভোররাতে তুমি যে দুজনকে আবছা মতন দেখেছিলে তাদের একজন আরেকজনকে এইভাবে মেরেছে?

হ্যাঁ।

পরে তুমি পুলিশকে ঘটনাটা জানাওনি?

না। কে যায় ওসব ঝামেলায়। পুলিশকে তো নয়ই, কখনই কাউকে ঘটনাটা আমি বলিনি। আজই প্রথম তোকে বললাম।

কেন বললে?

জানি না। বলতে ভাল লাগল। অনেকদিন বুকের ভেতর চেপে ছিল ঘটনাটা। আজ তোকে বলে বুকটা কেমন হালকা লাগছে।

পরে কি লোকটার পরিচয় টরিচয় জানা গিয়েছিল?

তেমন কিছু জানা যায়নি। পাড়ার লোকরা নাকি শুনেছিল লোকটা পুরনো ঢাকার। একসময় মাঝারি ধরনের গুন্ডা ছিল।

গুন্ডা কথাটা শুনে শারমিন কেমন যেন স্বস্তি পেল। ও গুন্ডা ছিল! তাহলে ঠিকই আছে। গুন্ডারা তো এইভাবেই মরে।

কিন্তু তখন লোকটা প্রায় বৃদ্ধ। গুন্ডামি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল।

তাহলে হয়তো কেউ পুরনো শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছে।

হয়তো তাই হবে।

দুজনেরই খাওয়া শেষ। টিস্যু পেপারে আলতো করে ঠোঁট মুছল শারমিন। আমি কিন্তু ঘটনাটা শুনে খুব একটা অবাক হইনি বাবা।

কেন?

আমার কাছে এমন কিছু ঘটনা মনে হয়নি। এরকম ঘটনা অনেক ঘটে।

কিন্তু আমার কাছে ঘটনাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালে প্রায় মৃত্যুর কাছে চলে যাচ্ছে আমার স্ত্রী, তাকে শেষ দেখার জন্য ছুটছি, আর ঠিক সেই মুহূর্ত চোখের সামনে দেখছি একজন মানুষ নিঃশব্দে মেরে ফেলছে আরেকজনকে। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারছি না।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে শারমিন বলল, তোমার মনোভাবটা আমি বুঝেছি বাবা। চলো উঠি।

বিল মিটিয়ে ওরা যখন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুচ্ছে, তখন সেই মানুষটার কথা আবার মনে পড়ল শারমিনের। আর মাঝখান থেকে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন। 'গোপনে তোমারে সখা...'। কেন যে, শারমিন নিজেও তা জানে না।

অলংকরণ : **কনক আদিত্য**